ISSN 2072-3334
Development Compilation
Vol. 05. No. 01. February 2011

দিনাজপুরের রামসাগরঃ ঐতিহাসিক নিদর্শন ও আর্থ-সামাজিক প্রভাব

মোঃ গোলাম রসুল*

Abstract: Ramsagar situated in Dinajpur, the northern district of Bangladesh, has been playing a prominent role for its historical excellence and as a parjotan centre. The renowned scion of Dinajpur Raj, Raja Ramnath has made a place, for his glorious performance, in the minds of the people of Bangladesh especially of Dinajpur. The earlier contributions of Raja Ramnath for the well-being of the people extended the fame of the Dinajpur Raj dynasty. Subsequently, a good number of development works, done by the Parjotan centre and forestry, have extended her programmes and developed its scenic beauty. The Grameen Matsha and Pashushampud Foundation, an associate institution of the Grameen Bank, has taken in lease this Ramsagar from the Ministry of Fisheries and Livestock for fish cultivation, and this set an extraordinary example of socio-economic development. Over all, the water and fishes of Ramsagar have been used for the welfare of the people. Hence it may be expected that as an excellent work of Raja Ramnath, the Ramsagar will accelerate the speed of socio-economic development of Dinajpur nay the whole of Bangladesh.

রাজশাহী বিভাগের অন্তর্ভূক্ত বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিমের সর্বশেষ জেলা দিনাজপুর। এই জেলা ২৫°-১৪′ ও ২৬°-৩৮′ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°-০৫′ ও ৮৯°-১৮′ পূর্ব দ্রাঘিমার মাঝামাঝি অবস্থিত।[১] দিনাজপুর জেলার উত্তরে পশ্চিম বঙ্গের জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং, পশ্চিমে ভারতের পূর্ণিয়া ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলা, দক্ষিণে পশ্চিম দিনাজপুর (ভারত) ও বগুড়া জেলা এবং পূর্বে রংপুর ও বগুড়া জেলা।[২] অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ড় বিভিন্ন ঐতিহাসিক পটভূমিতে দিনাজপুর বহু ভৌগোলিক অংশে পরিবর্তিত হয় এবং বিভিন্ন ঐতিহাসিক নাম ধারণ করে। পৌরাণিক আমলে দিনাজপুর অঞ্চলকে মৎস্যদেশ, বিরাটরাজ্য, জ্যোতিষদেশ, প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হতো।[৩] প্রাচীন ঐতিহাসিক যুগে দিনাজপুর অঞ্চল কিরাদিয়া, গঙ্গারিডি, পুন্ড্রদেশ, পুন্ড্রিকামত্তন, কোটিবর্ষ, পঞ্চনগরী নামে পরিচিত ছিল। মুসলিম শাসনামলে বরেন্দ্রী, দেওকোট (দেবকোট), গৌরদেশ, ঘোড়াঘাট ইত্যাদি খ্যাতি সম্পন্ন নামগুলো দিনাজপুর অঞ্চলের সাথে জড়িত ছিল। ইংরেজ শাসনামলের পূর্বে দিনাজপুরের নাম ছিল ঘোড়াঘাট সরকার।[৪] দিনাজপুরের নামোৎপত্তির ইতিহাস অনেকটা অজ্ঞাত হলেও দিনাজপুর জেলা ও জেলা সদর দিনাজপুর শহরের নামকরণের উৎস এক ও অভিন্ন

* প্রভাষক, আমবাড়ী ডিগ্রী কলেজ, পার্বতীপুর, দিনাজপুর।

বলে মনে করা হয়। দিনাজপুরের নামকরণের সঠিক কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে বুকানন হ্যামিলটনের মতে, বাংলার সিংহাসনে অনধিকার প্রবেশকারী 'দিনওয়াজ' বা গণেশের সংগে, এই নামের যোগসূত্র আছে। অবশ্য এই অভিমতের পেছনে কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না।[৫] দিনাজপুর নামটি এ অঞ্চলের একটি আধুনিক নাম। দিনাজপুর রাজবাড়ী যে মৌজায় অবস্থিত তা দিনাজপুর নামেই পরিচিত।[৬]

অবিভক্ত বাংলার ২৯টি জেলার মধ্যে অন্যতম একটি জেলা দিনাজপুর।[৭] এই জেলা সর্বপ্রথম জেলা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে। তখন জেলার থানা সংখ্যা ছিল ৩০টি। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে অবিভক্ত দিনাজপুর জেলার ৩০টি থানার মধ্যে ১টি থানার আংশিক এবং সম্পূর্ণ ৯টি থানা তদানীন্ড়ন পূর্ব-পাকিস্ড়ানের দিনাজপুর জেলার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। জেলার দেবীগঞ্জ, বোদা, তেতুঁলিয়া ও পঞ্চগড় (পচাঁগড়) থানাকে কেটে দিনাজপুর জেলার সঙ্গে যুক্ত করা হয়।[৮]

ভূ-প্রকৃতি অনুসারে সমগ্র জেলাটি হিমালয় পাদদেশের পলি অঞ্চল, তিস্ড়ার পলি অঞ্চল এবং বরেন্দ্র অঞ্চলে বিভক্ত। ভূ-তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে জেলার উত্তরাঞ্চল তুলনামূলক ভাবে নবীনতর পলি-গঠিত এবং জেলার দক্ষিণ দিকের মাটি প্রাচীন পলি দ্বারা গঠিত। এ মাটির রং লালচে এবং স্থানীয়ভাবে "খীহার" বা "খীয়ার" নামে পরিচিত। বর্ষাকালে এই মাটি থাকে নরম আঠালো দো-আঁশ আর শুষ্ক ঋতুতে হয়ে যায় প্রায় সিমেন্টের মত শক্ত। জেলার উত্তর দিকের অর্ধাংশ এবং দক্ষিণ দিকের প্রধান প্রধান নদীর তীরবর্তী এলাকার মাটি বেলে। একেবারে উত্তর সীমান্ড়ের মাটিতে কংকরের মিশ্রন দেখা যায়।

প্রধানত দু'প্রকার আদি বস্তুর ওপর ভিত্তি করে সমগ্র জেলার মাটি গড়ে উঠেছে। নতুন ও পুরাতন পলি সমূহ এবং পুরাতন মধুপুর কর্দম এর অন্ড়র্ভূক্ত। পলিঅংশটি রয়েছে হিমালয় পাদদেশের পলল ভূমি এবং তিস্ড়া পণ্ডাবন ভূমিতে। অপরদিকে বরেন্দ্র ভূমিতে রয়েছে মধুপুর কর্দম।[৯] দিনাজপুর জেলার অধিকাংশ নদীই উত্তর দিক থেকে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত এবং তাদের সর্বশেষ গন্ড়ব্যস্থল গঙ্গা, যমুনা নদী। নদীগুলোর গভীরতা আশে পাশের ভূমির উপরিভাগ থেকে অনেক বেশি এবং শুধুমাত্র অতিরিক্ত বর্ষা হলেই নদীগুলোর তীরবর্তী এলাকা পণ্ডাবিত হয়।[১০] দিনাজপুর জেলার অবস্থান হিমালয়ের পাদদেশ অঞ্চলে। এ জেলার উভয় সীমান্ড়ের ওপারে তরাই অঞ্চলের বিস্ড়ীর্ণ বনভূমি বিদ্যমান এবং তরাই-এর অংশ বিশেষ দিনাজপুর জেলার অন্ড়র্ভূক্ত হয়েছে। যদিও গভীর অরণ্য এ অঞ্চলে নেই, তবুও বিচ্ছিন্নভাবে জেলায় সমগ্র উত্তরাঞ্চলেই এবং দক্ষিণের কোথাও কোথাও শালবন দেখা যায়। উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলে অনাবাদী তৃণভূমি ও লতাগুল্মের ঝোপ-ঝাড় পরিলক্ষিত হয়। বনভূমির শ্রেণী বিভাগের দিক হতে বাংলাদেশ অন্যান্য অঞ্চলের মতো দিনাজপুর জেলায় প্রধানত চির সবুজ বৃক্ষের বন দেখা যায়।[১১]

কম্পানী শাসনের শুর"তেই ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সমগ্র বাংলাদেশ জেলায় বিভক্ত হয়। বৃহত্তর দিনাজপুর জেলা সে সময়ে গঠিত হয়। তখন এ জেলার আয়তন ছিল প্রায় ৬ হাজার বর্গমাইল। জেলার বর্তমান অংশ বাদেও পার্শ্ববতী রংপুর, বগুড়া, রাজশাহী, মালদহ ও পূর্ণিয়ার সংলগ্ন বিরাট এলাকা দিনাজপুর জেলার অন্ড়র্ভূক্ত ছিল। কিন্তু দিনাজপুরের রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক আইন শৃংঙ্খলার উন্নতি সাধন এবং সাধারণ

নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য প্রায় ছয়বার অঙ্গচ্ছেদ করা হয় এবং এর ভৌগোলিক আয়তনের স্থিতিশীলতা বিনষ্ট করা হয়।[১২] বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে সীমায়তন ছিল ৫,৩১৪ বর্গ মাইল, ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে ৪,৫৮৬ বর্গমাইল, ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে ৪,১৪২ বর্গমাইল এবং ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ৩,৯৪৬ বর্গমাইল কিন্তু বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ারে বৃহত্তর দিনাজপুরের আয়তন ৩,৯৪৮ বর্গমাইল উলেণ্ঢখ আছে। আয়তনের দিক দিয়ে বাংলাদেশের এ জেলা ১২তম স্থানের অধিকারী।[১৩] ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর থেকে আশির দশক পর্যন্ড় জেলাসমূহের আয়তনের তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি। ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ সরকার প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের নীতি অনুসরণ করে বৃহত্তর জেলাসমূহ বিভক্ত করে নতুন নতুন জেলা স্থাপন করে। বস্তুত, এ সময়ে মহকুমাসমূহকে জেলায় এবং থানা সমূহকে উপজেলায় উন্নীত করা হয়। নতুন জেলা প্রতিষ্ঠার এই নীতি অনুসারে বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার (সদর মহকুমাসহ) তিনটি মহকুমাকে জেলায় উন্নীত করা হয়। ফলে দিনাজপুর জেলা, দিনাজপুর, পঞ্চগড় এবং ঠাকুরগাঁও নামক পৃথক তিনটি জেলার সৃষ্টি হয়। দিনাজপুর জেলায় অন্ড়র্ভূক্ত হয় পূর্বতন সদর মহকুমার ১৩টি উপজেলা।[১৪] এই উপজেলাগুলো হলো যথাক্রমে কোতয়ালী (সদর), চিরিরবন্দর, কাহারোল, খানসামা, বীরগঞ্জ, বোচাগঞ্জ, বিরল, ফুলবাড়ী, ঘোড়াঘাট হাকিমপুর (হিলি), নবাবগঞ্জ, পার্বতীপুর এবং বিরামপুর। বলাবাহুল্য ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে প্রশাসনিক বিভাজনের পর দিনাজপুর জেলার আয়তন পুনরায় হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১৩২৭.৪১ বর্গমাইল বা ৩৪৩৭.৯৮ বর্গ কিলোমিটার,[১৫] ঠাকুরগাঁও জেলার আয়তন ১৮০৯.৫২ বর্গ কিলোমিটার,[১৬] এবং পঞ্চগড় জেলার আয়তন ৫৯৩.২৪ বর্গমাইল।[১৭] কিন্তু মিনিস্ট্রি অব পণ্ঢানিং এর রিপোর্ট অনুযায়ী দিনাজপুরের আয়তন ১৩২৭.৪১ বর্গমাইল বা ৩৪৩৭.৯৮ বর্গ কিলোমিটার। ঠাকুরগাঁও এর আয়তন ৬৯৮.৬৬ বর্গমাইল বা ১৮০৯.৫২ বর্গ কিলোমিটার এবং পঞ্চগড়ের আয়তন ৫৪২.৩৩ বর্গমাইল বা ১৪০৪.৬৩ বর্গ কিলোমিটর।[১৮]

সমস্ড় গৌরব ঐতিহ্য, সমস্যা সম্ভাবনা ও সুখ্যাতির অংশীদার হিসেবে পূণ্যাত্মা চেহেল গাজীর মাজারের খুব কাছে উন্নয়ন গতিধারার নতুন প্রতীক দিনাজপুরের এই সদর উপজেলা অবস্থিত। এর আয়তন ৩৬০ বর্গ কিলোমিটার। উত্তরে কাহারোল উপজেলা, দক্ষিণে ভারত, পূর্বে চিরির বন্দর এবং পশ্চিমে বিরল উপজেলা। এই উপজেলাটি ২৫°২৮′ হতে ২৫°৪৩′ ডিগ্রী অক্ষাংশে এবং ৮৮°৩৪ হতে ৮৮°৪৬ ডিগ্রী দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত।[১৯] দিনাজপুর সদর উপজেলার মোট ইউনিয়ন ১০টি, পৌরসভা ১টি, মৌজা ২১৬টি এবং গ্রাম ২৫৮ টি (পৌরসভাসহ)।[২০] জনসংখ্যা ৪,২৫,২৪০ জন, এর মধ্যে পুর"ষ ২,১৯,১২০ জন, মহিলা ২,০৬,১২০ জন।[২১] এখানে হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়সহ মেডিকেল কলেজ ১টি, সাধারণ কলেজ ২৭টি, মাধ্যমিক স্কুল ৭০টি, মাদ্রাসা ৩১টি, সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ১১৭টি, বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ৫৭টি। এছাড়াও প্রাইমারী শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ১টি, ইমাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ১টি, জিমন্যাসিয়াম ১টি ও শরীরচর্চা কেন্দ্র ১টি, পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট ১টি, সরকারী কর্মাশিয়াল ইনস্টিটিউট ১টি, টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট ১টি, হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল ১টি। মসজিদ রয়েছে ৭৩০টি, মন্দির ৮৮টি, গীর্জা ২টি, শিল্প প্রতিষ্ঠান ৬৩৭টি।[২২]

ভূমির গঠন অনুসারে উপজেলার ভূমি দু'ভাগে বিভক্ত যথা মধ্যম ভূমি ৮৫% নিম্ন ভূমি ১৫% ভাগ। মাটির প্রকৃতি অনুসারে উপজেলার মাটি এ'টেল শতকরা ৫%, বেলে দোআঁশ ৬৫% ও বেলে মাটি ৩০% ভাগ। বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাত ২২০০ মি.মি., আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ। উপজেলার মধ্য দিয়ে পূর্ণভবা, গর্ভেস্বরী ও ঘাঘরা নদী প্রবাহিত।[২৩] উপজেলার প্রধান প্রধান ফসলের মধ্যে রয়েছে ধান, গম, আখ, সরিষা ও আলু। রফতানীযোগ্য পণ্যের মধ্যে রয়েছে ধান, পাট, তুলা, আখ, আলু, আম, লিচু ও চাল ইত্যাদি। উপজেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা কিছুটা উন্নত হলেও তা মূলত শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ, উপজেলা সদরের সাথে ইউনিয়নের যোগাযোগ ব্যবস্থা মোটামুটি উন্নত। পাকা রাস্ড়া রয়েছে ১৪৭ কি.মি. কাঁচা রাস্ড়া রয়েছে ৪৭৪ কি.মি.। উপজেলার মধ্যে ১৮টি হাট, ক্লাবের সংখ্যা ৭৮টি, লাইব্রেরী ৩টি রয়েছে ।[২৪]

রামসাগর

ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক কীর্তির গৌরবে বাংলাদেশ যে বিশ্বের দরবারে গর্বিত ও গৌরবান্বিত তার অন্যতম কীর্তি-সম্পদের একটি হচ্ছে রামসাগর। শুধু আকারের বিশালতায় নয়, শোভা সৌন্দর্য ও স্বচ্ছতায় এই দীঘি অতুলনীয় এবং এর পরিচয় দেশীয় ও আন্ড়র্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন। রামসাগর শুধু ঐতিহাসিক কীর্তিই নয়-ইহা প্রাকৃতিক শোভা ও সৌন্দর্যের লীলা ভূমিও। দীঘির পাড়ের উচ্চ টিলার ওপর অবস্থিত সুন্দর মনোরম ডাকবাংলোটি দেশী ও বিদেশী অসংখ্য কৌতুহলী পর্যটকদের নিকট যেমন প্রতিনিয়ত স্বপ্নিল আকর্ষণ তেমনি অনেক রসিক ব্যক্তির নিকট প্রমোদ বিহার বা নিরিবিলি অবকাশ যাপনের জন্য নিভৃত নিকেতনও বটে। এই দীঘির মুগ্ধ ও স্নিগ্ধ পরিবেশ শ্রান্ড়ি ও ক্লান্ড়ি বিনোদনের জন্য সারা বছরে অসংখ্য পরিশ্রান্ড় মানুষ ছুটে আসেন। তাঁরা অনেকে উন্মন্য উদ্বিগ্ন হয়ে ঘুরে বেড়ান কিছুক্ষণের জন্য, নিজকে নিজের মধ্যে খুঁজে পাবার জন্য।[২৫]

বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠতম ও সুন্দরতম দীঘি রামসাগর দিনাজপুর শহর থেকে ৮ কি.মি. দক্ষিণে আউলিয়াপুর ইউনিয়নের তাজপুর গ্রামে অবস্থিত। চারিদিকে সবুজ প্রান্ড়র, মাঝখানে পাহাড়ের ধূসরবর্ণ ছোট ছোট মাটির টিলার পাড় দ্বারা বেষ্টিত গ্রামীণ উদাস প্রকৃতির মধ্যে এক খ" লাল গৈরিক ও স্ফীতময় খিয়ার মাটির ওপর এক অপরূপ মনোমুগ্ধকর পরিবেশ এই সাগরোপম দীঘি অবস্থিত।[২৬] পাড় ভূমিসহ দীঘির মোট আয়তন ৪,৩৭,৪৯২ বর্গ মিটার। জলভাগের দৈর্ঘ্য ১০৩১ মিটার, প্রস্থ ৩৬৪ মিটার, গভীরতায় গড়ে প্রায় ৯ মিটার। সর্বোচ্চ পাড়ের উচ্চতা প্রায় ১৩.৫০ মিটার, জলভাগের আয়তন ৭৭.৯০ একর, পার্কভূমি ৬৮.৫৪ একর। দক্ষিণ দিকের চেয়ে উত্তর দিকটা গভীরতায় একটু বেশি।[২৭] রামসাগর দীঘির চারিদিকে বেষ্টিত করে টিলার মত উঁচু পাড়গুলোর সব অংশের উচ্চতা সমান নয়। উত্তর-পূর্ব কোণাংশে অবস্থিত পাড়টির উচ্চতা সর্বাধিক বেশি এবং উহা ভূমিসমতল থেকে ৪০′ ফুট উচুঁ। রামসাগর শুধু দিনাজপুরের মধ্যে নয় বাংলাদেশের মধ্যে বিদ্যমান প্রাচীন দীঘিগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম দীঘি। শুধু সুবৃহৎ ও বিস্ময়কর দীঘি হিসেবেই খ্যাত নয়- স্ফুটিকতুল্য স্বচ্ছ তোয়া পানির জন্যও এ দীঘি অতুলনীয়। সুপরিকল্পিত ভূমি নকশার ওপর খননকৃত আড়াইশত বছরের অধিক পুরাতন হয়েও এই দীঘি কোনো সংস্কার ও সংরক্ষণের প্রয়োজন

ব্যতিরেকেই আজও অক্ষত রয়েছে এবং পানির উজ্জ্বল্য বিরাজ করছে চির অম্লান হয়ে।[২৮]

দীঘির প্রধান পাকা ঘাট ছিল পশ্চিম পাড়ের ঠিক মধ্যস্থলে। ঘাটের দৈর্ঘ্য ১৫০′ফুট এবং প্রশস্ততা ৬০′ ফুট। ঘাটের চারি পাশে পাড় দেয়াল ও পাটাতন সবটাই পাষাণ মন্ডিত। প্রথম সোপান থেকে ১০ ধাপে ঢালু হয়ে ১৫′ফুট প্রশস্ত সোপানগুলো ক্রমাবনতভাবে নেমে গেছে পানির গভীরে। সুবৃহৎ সাইজ করা বেলে পাথর দ্বারা ঘাটটি নির্মিত। পাথরের শল্কাবগুলো আকার ও আকৃতিতে সব সমান সাইজের নয়। এই অসমান পাথরগুলো দিয়েই ঘাটটির উপরিভাগ আগাগোড়া মন্ডিত। এছাড়াও দীঘির উত্তর ও দক্ষিণ দিকেও ছোট আকারে ঘাট ছিল। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে প্রচন্ড খরায় এবং কৃষি ক্ষেতের জন্য অতিরিক্ত পানিসেচের নিমিত্তে রামসাগর প্রায় পানি শূন্য হয়ে পড়েছিল। ফলে পাষাণ বাঁধান ঘাটটি তার সম্পূর্ণ অবয়ব নিয়ে আবিষ্কৃত হয়ে ওঠে। ফলে সম্পূর্ণভাবে জলমুক্ত ঘাটটির সামগ্রিক দৃশ্য কৌতুহলী দর্শকেরা দেখার সুযোগ পেয়েছিল।[২৯]

উলেণ্ঢখ্য রামসাগরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটি রাজবংশের নাম। দিনাজপুর রাজবংশের ঘটনাবহুল ইতিহাসে এমন ক'জন নৃপতির পরিচয় পাওয়া যায়, যারা ছিলেন অপরাজেয় সামন্ড ও সমসাময়িক রাজন্যকুলের শিরোমণি। তন্মধ্যে রাজা প্রাণনাথ (১৬৮২-১৭২২) এবং রাজা রামনাথ (১৭২২-১৭৬০) ছিলেন সামন্ড শ্রেষ্ঠ রাজা। শৌর্য বীর্যে অমিত বিক্রমশালী বিজেতা ও নির্মাতা হিসেবে ছিলেন ইতিহাস খ্যাত। এদের আমলেই দিনাজপুর জমিদারী সর্বাধিক বিস্তৃতি ও খ্যাতি লাভ করে। সক্ষম বিজেতা ও দক্ষ শাসক হিসেবে এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা প্রাণনাথের পুত্র রামনাথ কর্তৃক রামসাগর দীঘি খনন করা হয়। সুতরাং রাজা রামনাথের নামানুসারে এই দীঘির নামকরণ করা হয় রামসাগর। দিনাজপুর রাজবংশের ইতিহাস মতে ১৭৫০ থেকে ১৭৫৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে অর্থাৎ পলাশীর যুদ্ধে অব্যবহিত পূর্বে রামসাগর দীঘি খনন করা হয়। রাজা রামনাথের শক্তি ও সম্পদের অন্যতম অতুল্য কীর্তি হয়ে খনন করা হয়েছিল দেশ বিখ্যাত রামসাগর দীঘি।[৩০] বাংলার নবাব আলিবর্দী খাঁনের (১৭৪০-১৭৫৬) সময় রামসাগর দীঘি খনন করা হয়। তাঁর শাসনামলের ইতিহাসের সবচেয়ে দুঃখময় ও দুর্যোগপূর্ণ অভিশপ্ত ঘটনা ছিল কুখ্যাত বর্গীর হাঙ্গামা। অবশ্য-বর্গীর হাঙ্গামায় পদ্মাপারের আপামর জনজীবন বিপন্ন ও বিধ্বস্ত হলে রাজা রামনাথের শক্তি ও শৌর্যের দাপটে বর্বর লুটেরাদের হিংস্র উপদ্রব থেকে উত্তর বঙ্গের সামাজিক জীবন ও ধন সম্পদ ছিল প্রায় নিরাপদ। তাছাড়া বণিক বেশী ইংরেজ আক্রমণকারীদের ক্ষমতা দখলের অশুভ পায়তারা পদ্মার ওপারেই সীমাবদ্ধ ছিল। ফলে শান্ডি ও সম্পদের ফলে হিসেবে রাজা রামনাথের পক্ষে অসাধ্য শ্রমসাধ্য ও অগণিত ব্যয় সাপেক্ষ, খনন করা সম্ভবপর হয়েছিল এই সাগরোপম দীঘি রামসাগর।[৩১]

রামসাগর দীঘি খনন নিয়ে ছড়িয়ে রয়েছে বহু উপাখ্যান ও উপকথা। অনেকের মতে, প্রাচীন সেচ ব্যবস্থার উপায়স্বরূপ রামসাগর দীঘি খনন করা হয়। পক্ষান্ড়রে বহুল প্রচলিত ও জনপ্রিয় উপাখ্যান রয়েছে যার মর্মকথা থেকে অবগত হওয়া যায় যে, দীঘি খননের অন্ড়রালে নিহিত রয়েছে একটি নিদারুণ দুর্ভিক্ষের সকরুণ ইতিহাস। মনে করা হয়, যে সময় রামসাগর দীঘি খনন করা হয়, সে সময় প্রচন্ড খরার দরুণ দেশের

বুকে নেমে আসে নিদারুণ দুর্যোগ ও দুর্বিপাক। বৃষ্টিপাতের অভাবে বিশ্বপ্রকৃতি মলিন হয়ে যায়। ক্ষেতের ফসলাদি বিনষ্ট হয়, মাঠ ফেটে চুরচুর হয়। বৃক্ষের পাতা শুকিয়ে ঝরে পড়ে যায়, সুতরাং হাজার হাজার সহায় সম্বলহীন নিরূপায় প্রজা খাদ্য ও পানীয় জলের অভাবে নির্ঘাত মৃত্যুর দ্বারে উপনীত হয়। দয়ালু রাজা রামনাথ তাই আর্তত্রাণের নিমিত্ত মহোদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে এই বিশাল দীঘি খনন করেন।[৩২] এইসব উপকথা ছাড়াও রামসাগর দীঘি খননকে কেন্দ্র করে বেশ কয়েকটি রূপকথা বা কাহিনী প্রচলিত আছে। কাহিনীগুলোর মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে পারস্পরিক সঙ্গতি বিদ্যমান এবং ঘটনার কারণ্যে সব কাহিনীগুলো একই রূপ চমকপ্রদ ও মর্মান্ড়িক। তার মধ্যে কোনো কাহিনীকে দীঘির গর্ভের প্রিয়তমা রাজরাণীর হৃদয় বিসর্জন দেবার কথা এবং নাকে নথ পরিহিত অবস্থায় বৃহৎ চান্দা মাছের রূপ ধারণ করে মৃত রাণীর জলের ওপর ভেসে বেড়ানোর উপকথাটিও অত্যন্ড় জনপ্রিয়। আবার কোনো কোনো কাহিনীতে জলমগ্ন রাজকুমারের মরণোত্তর দিনে প্রতি পূর্ণিমার রাতে মাথায় স্বর্ণমুকুট পরে নৌকায় জলকেলী করে রাত্রি কাটানোর কথা বর্ণিত আছে।[৩৩]

রামসাগর দীঘি যখন খনন করা হয় তখন যান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যম একেবারে ছিল না। একমাত্র কোঁদাল ও কায়িক পরিশ্রম ছিল মাটি খননের উপায়-সে কালে রামসাগরের মত এতবড় সুগভীর দীঘি কিভাবে খনন করা সম্ভব হলো তার বাস্ড়বতা চিন্ড়া করতে অবাক লাগে। যান্ত্রিক সভ্যতার পূর্বের দিনের বিচারে যে ব্যবস্থাটি সর্বাধিক যুক্তিসঙ্গত বলে বিবেচ্য তা এই যে-দীঘিটি খনন করতে লেগেছে একাধিক বছর এবং প্রণীত ভূমি নক্সার মাধ্যমে খন্ড খন্ড ভাবে খনন করা হয়েছে। সুতরাং পরস্পর সংলগ্নভাবে খনন করা খালগুলো সমষ্টির সমন্বয়ে দীঘির এই বিশাল ও বিরাট অবয়ব অবশেষে গড়ে ওঠা সম্ভব হয়েছে।[৩৪] কি পরিকল্পনায় দীঘি খনন করা হয়েছিল, দীঘির গভীরতায় তার পূর্ত নিদর্শন বরাবর নিমজ্জিত থাকায় বাস্ড়বে তা দেখার কোনো দিন কারো সুযোগ হয়নি। কারণ রামসাগরের পানি কোনো দিন শুকোয় না, অতীতে কোনো কালে শুকিয়ে ছিল বলে প্রমাণ নেই। তাই অসংখ্য কুসংস্কার ও ভয়ভীতিপূর্ণ গালগল্পে সমাচ্ছন্ন এই দীঘির সুগভীর তলদেশ বরাবর মানুষের কাছে ভয়ভীতিপূর্ণ দুর্জ্ঞেয় ও রহস্যাবৃত ছিল। জনশ্রুতি আছে যে, দীঘির মাঝখানে একটি ক্ষুদ্রাকায় মন্দির ছিল এবং তা নির্মিত হয়েছিল পূজার মন্দির হিসেবে। কিন্তু ভয় ভীতির কারণে কোনো দিন কেউ ডুব দিয়ে মন্দির স্পর্শ করেনি। অন্যভাবে দীঘির তলদেশ তথ্যানুসন্ধানের কেউ চেষ্টা করেনি।[৩৫]

অবশেষে সকল অলৌকিক ঘটনা, বৈজ্ঞানিক সত্যতা এবং বহুকালের দৃঢ়মূল বিশ্বাস ও কুসংস্কারকে মিথ্যা প্রমাণিত করে ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের প্রচন্ড খরায় এবং পার্শ্ববর্তী ইরিক্ষেতের সেচের জন্য অনেকগুলো পাওয়ার পাম্প দ্বারা প্রতিনিয়ত পানি উত্তোলন করায় দীঘির পানি আশাতীতভাবে শুকিয়ে যায়। এর ফলে তলদেশে অবস্থিত দীঘি খননের নীল নক্সার প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশিত হয়। লক্ষ্য করা যায় তলদেশের বুকে উত্তর দক্ষিণে লম্বমানভাবে টানা ৪টি আইলের অস্ড়িত্ব। এই আইলের অস্ড়িত্বের কারণ আবিস্কৃত করতে গিয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, মোট পাঁচভাগে বিভক্ত করে বিশাল ঘাটটি খনন করা হয়েছিল।[৩৬]

রামসাগর দীঘিটি ৫ বছরে ৫ ভাগে অর্থাৎ উত্তর দক্ষিণে প্রলম্বিত প্রায় ৬১ মিটার (২০০ ফুট) করে চার বছরে ৬১×৪= ২৪৪ মিটার (২০০×৪=৮০০ ফুট) এবং ৫ম বছরে

১২২ মিটার (৪০০ ফুট) মোট ৩৬৪ মিটার (১২০০ ফুট) খনন করা হয় বলে জানা যায়।[৩৭]

সাধারণত বিশাল ও গভীর প্রাচীন দীঘি সমূহের তলদেশে দেবতার ঋণ এবং নানা প্রকার ভৌতিক সম্পদ সঞ্চিত থাকে বলে বিশ্বাস করা হয়। রামসাগরের ক্ষেত্রেও দেবতার অগণিত সোনার থালা বাসন, ডেকচি, সোনার পালকী, জিঞ্জির ইত্যাদি এবং মধ্যস্থলে স্বর্ণমন্দির রয়েছে বলে ধারণা ও বিশ্বাসটি অতি সার্বজনীন। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের প্রচন্ড খরায় পানি শুকনোর ফলে রামসাগরের মধ্যস্থলে অবস্থিত কল্পিত মন্দিরটির জলমগ্ন অস্তিত্ব বাস্তবভাবে অনুমান করা সম্ভব হয়। ভয়-ভীতির কারণে চাক্ষুষভাবে সম্ভব না হলেও মাছ ধরা জাল ও নৌকার লগীর দ্বারা মন্দিরটির অস্তিত্ব ধরা পড়ে। তবে উক্ত শুকনোর বছরে পরিদৃষ্ট হয় যে, দীঘির পশ্চিম পাড়ে যেখানে ডাকবাংলোটি অবস্থিত তার পূর্ব বরাবর-স্থলভাগের সীমানা থেকে মাত্র কয়েক গজ দূরে পানির নিচে কাঁদায় প্রথিত দু'খানা নৌকার চিহ্ন। রাজকীয় প্রমোদ বিহারের জন্য ব্যবহৃত নৌকাদ্বয় তখন থেকে প্রায় শতাধিক বছরের পুরাতন বলে স্থানীয় গ্রামবাসী বৃদ্ধ ব্যক্তিদের অনুমিত হয়। দিনাজপুর যাদুঘরে সংরক্ষণের জন্য ট্রাক্টর দিয়ে গ্রামবাসীদের সহায়তায় একটি নৌকা টেনে তুলতে গিয়ে সামান্য ছিন্নাংশ মাত্র ডাঙ্গায় উত্তোলন করা সম্ভব হয়। অপর নৌকাটি আস্ত পানির নিচে থেকে যায়। নৌকার সেই সামান্য অংশগুলো দিনাজপুর যাদুঘরে সংরক্ষণ করা হয়। নৌকার সংরক্ষিত ছিন্নাংশটি বিলক্ষণ কারুকার্য খচিত ছিল।[৩৮]

দীঘি খননের সঠিক ব্যয় নির্ধারণ করার মত এখনও কোনো উপায় নেই এবং রাজবংশের ইতিহাসেও সঠিক কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। রামসাগর যখন খনন করা হয় তখন অর্থাৎ নবাবী শাসনের শেষদিকে চালের মূল্য ছিল আনুমানিক টাকায় চারমণ অর্থাৎ আধুনিক পয়সায় একমণ চাল পাওয়া যেতো। সুতরাং তৎকালীন আর্থিক মূল্যে এক হাজার বর্গফুট মাটি কাটার খরচ ছিল ৩০ সের চাল, যার মূল্য ছিল আনুমানিক ২০ পয়সা মাত্র।[৩৯] বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন অবস্থাদি বিবেচনা পূর্বক রামসাগর খননের যে একটা আনুমানিক খরচ নিরূপণ করতে সক্ষম হয়েছেন তা নিম্নে উপস্থাপিত হলো।

তখন ৬৪ পয়সায় অর্থাৎ ১৬ আনায় এক টাকা, চার পয়সায় ১ আনা, তিন পাইয়ে ১ পয়সা হতো এবং বার পাইয়ে হতো এক আনা। দিনাজপুর জনপথ বিভাগের সহকারী প্রকৌশলী মোঃ হাসান ইমাম খাঁন কর্তৃক তার অফিস সহকারীদের সহায়তায় যে হিসাব প্রণীত (১৯৮০-৮১) করা হয়েছিল তা নিম্নরূপ।

১৯৮০-৮১ খ্রিস্টাব্দের মূল্যে ১,১৮,৩১০ মণ চালের মূল্য ২,৩৬,৬২,৮০০.০০ টাকা। অর্থাৎ মোটামুটি আড়াই কোটি টাকা মাত্র। যা প্রাচীন মূল্যে ১,১৮,৩১০ মণ চালের দাম ২৯,৫৭৮.০০ টাকা অর্থাৎ মোটামুটি ৩০ হাজার টাকা মাত্র। ১৫ লক্ষ শ্রমিক রামসাগর খনন কাজে নিয়োজিত ছিল। শ্রমিক ছাড়াও বিভিন্ন পর্যায়ের তদারকী কর্মচারী, খাজাঞ্জী, পাইক পেয়াদাসহ সংখ্যায় ছিল অনেক।[৪০]

অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে যখন রামসাগর দীঘি খনন করা হয়, সেই সময় আমাদের দেশে পর্যটন শিল্পের মূল্য-বোধের উন্মেষ ঘটেনি। আড়াইশত বছরের অধিক পুরাতন এই মনোমুগ্ধকর দীঘিটি ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত নির্জন জনপদের ধারে অজ্ঞাত

প্রায় একটি জলাভূমির মতই পড়ে ছিল। পূর্বকাল থেকে বারুণীর স্নান, সরস্বতী পূজা, দূর্গাদেবীর বিসর্জন[৪১] প্রভৃতি পূজা ও উৎসব উপলক্ষে সামান্য তীর্থ মেলার সমাগম হতো। ফলে ক্ষণিকের জন্য জেগে উঠতো দীঘির নির্জন পাড় ও প্রান্তর। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দেশ ভাগাভাগির পর রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনেও আধুনিকতার সাড়া জাগে। ফলে দীঘি দেখার অথবা দীঘির নির্জন নিরিবিলি পাড় ভূমির বুকে ভ্রমণ ও বনভোজন উৎসব উদযাপনের হিড়িক পড়ে। দিনাজপুরের বাইরেও রংপুর, রাজশাহী, বগুড়া, ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা প্রভৃতি জেলার সৌখিন নাগরিকগণ রামসাগর দেখার জন্য ভীড় জমায়। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে ১৬ই ডিসেম্বর দেশ স্বাধীনতা লাভের পর শীতকালীন বনভোজনের ভীড়ে জনসমাগম অত্যন্ত বেড়ে যায়।[৪২]

১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন বাঙালি, প্রিয় পূর্ব পাকিস্তানের গর্ভনর জেনারেল আজম খাঁন দিনাজপুর পরিদর্শনে এসে রামসাগরে যান। ভ্রমণতীর্থে ডাকবাংলোর অভাবটি তাঁর হৃদয়ে ভয়ানক পীড়া দেয়। সুতরাং তাঁরই নির্দেশক্রমে জরুরী ভিত্তিতে পশ্চিম দিকে অবস্থিত সর্বোচ্চ টিলার ওপর পূর্ববর্তী আধুনিক প্যাটার্ণের ডাকবাংলোটি নির্মিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে পুরাতন ডাকবাংলোটি ভেঙে একই টিলা খন্ডের ওপর আধুনিক ডিজাইনের অপেক্ষাকৃত সুন্দর, মনোরম বৃহদাকারে নতুন ডাকবাংলো নির্মিত হয়। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে রামসাগরের পাড় ভূমি বনবিভাগের এবং জলভাগ মৎস্য বিভাগের তত্ত্বাবধানে অধীনস্থ হয়।[৪৩] বন বিভাগ কর্তৃক রামসাগরের পাড় ভূমি অধীনস্থ হবার পর থেকে সে সময় যে উন্নয়ন কাজ সাধিত হয়েছে তার প্রধান হলো বৃষ্টি-বাদল জনিত ভূমিক্ষয় রক্ষা করা; বিশেষ করে উঁচু পাড়গুলোর উচ্চতায় স্বাভাবিক অবস্থা সংরক্ষণের জন্য টিলাগুলোসহ চারিদিকের পাড়-ভূমিতে নানা জাতের সুন্দর ও সুশোভন গাছপালা রোপন করা। বন বিভাগের মাধ্যমে রামসাগরের পরিকল্পিত উন্নয়ন কাজের মধ্যে অন্যান্য কাজগুলো হলো পশ্চিম পাড়ে একটি আধুনিক ধরনের রেস্তোঁরা নির্মাণ, দীঘির পূর্ব পাড়ে ৫টি পিকনিক শেড নির্মাণ, পানীয় জলের সরবরাহ ব্যবস্থা, দীঘির ভিতর দিকের পাড় ভূমির ওপর দিয়ে সমস্ত দীঘি প্রদক্ষিণ করার জন্য একটি পাকা রাস্তা নির্মাণ। জলকেলীর জন্য নৌকা বা স্পীড বোটের ব্যবস্থা রয়েছে।[৪৪] প্রয়োজনীয় সুযোগ ও সুবিধাগুলোর মোটামুটি সংস্থান হওয়ায় বর্তমান সময়ের দিনগুলোতে ভ্রমণ, বনভোজন ও অবকাশ যাপনের জন্য রামসাগরের বুকে আনাগোনার ভীড় ক্রমেই বেড়ে চলেছে। বিশেষ করে শীতকালে বিচিত্র সৌখিন মানুষের পদধূলিতে রামসাগরের পাড় ভূমি যেন তীর্থোৎসবের মত আকার ধারণ করে।[৪৫] স্থানীয় বন বিভাগ কর্তৃক সংগৃহীত পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে, বর্তমান কালে (২০০৯) ভ্রমণ, অবকাশ যাপন ও বনভোজন ইত্যাদি উৎসব উপলক্ষে প্রতি বছর ৪ লক্ষ অগণিত নর-নারী রামসাগরে ভীড় জমায়। তবে ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ থেকে তৎকালীন জেলা প্রশাসক এম,টি উদ্দিনের অনুমতি ক্রমে রামসাগর দর্শনার্থীদের ওপর ভিজিটিং ফি প্রবর্তন করা হয়।[৪৬] ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে রামসাগর বাংলাদেশ পর্যটন বিভাগের উন্নয়ন প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত হয়।[৪৭]

পূর্বকাল থেকে বড় বড় রুই কাতলা ও রাঘব বোয়াল মাছের জন্য রামসাগরের প্রসিদ্ধি ছিল।[৪৮] মৎস্য বিভাগ দীঘির নিয়মিত মাছ চাষের ব্যবস্থা করে। রামসাগরের মাছ অত্যন্ত স্বাধযুক্ত। বঁড়শী দিয়ে মৌসুমী মৎস্য শিকারের জন্য দীঘির পাড়ে শিকারীদের অত্যন্ত ভীড় জমে ওঠে।[৪৯] গ্রামীণ ব্যাংকের সহযোগী প্রতিষ্ঠান গ্রামীণ মৎস্য ও পশু

সম্পদ ফাউন্ডেশন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়ের কাছ থেকে ১৬/০২/১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে রামসাগরের ৭৭.৯০ একর জলায়তন লীজ গ্রহণ করে। পরবর্তীতে গ্রামীণ মৎস্য ও পশু সম্পদ ফাউন্ডেশন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাছ চাষ শুর করে। স্থানীয় ৫০ জন ভূমিহীন সদস্যের ৪০% শেয়ার এবং প্রতিষ্ঠানের ৬০% শেয়ারের মাধ্যমে মৎস্য কার্যক্রম পরিচালিত হতো। ১৯৮৮ থেকে ২০০৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ড় এ প্রতিষ্ঠানের মৎস্য চাষের কার্যক্রম বহাল ছিল। এই সময়কালে মৎস্য উৎপাদনের একটি তথ্য সারণীর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো।[৫০]

খ্রিস্টাব্দ	মোট উৎপাদন (টন)	মোট উৎপাদিত মূল্য (লক্ষ টাকা)	ভূমিহীন সদস্যদের শেয়ার (৪০%)
১৯৮৮-৮৯	৮.৫	২.২২	০.৮৮
১৯৮৯-৯০	৯.৪	২.৫২	১.০০
১৯৯০-৯১	১২.৪	২.৮০	১.১২
১৯৯১-৯২	১৩.২	৩.০৮	১.২৩
১৯৯২-৯৩	১৭.৩	৩.৮১	৩.৩০
১৯৯৩-৯৪	৩৪.০	৮.২৫	৩.৩০
১৯৯৫	৪০.০	৮.০০	৩.২০
১৯৯৬	৩৫.২	৭.৮০	৩.১২
১৯৯৭	২৫.৪	৫.২১	২.০৮
১৯৯৮	২০.৩	৪.৫০	২.১৬
১৯৯৯	২২.১	৫.১০	২.০৪
২০০০	১৮.২	৪.৮৬	১.৯৪
২০০১	১৮.৫০	৪.৯৬	১.৯৮
২০০২	১৮.৯০	৫.০৯	২.০৩
২০০৩	১৭.১০	৪.৭৬	১.৯০
২০০৪	১৯.২০	৫.৭০	২.২৮
২০০৫	২১.৫০	৬.৬৬	২.৬৬

গ্রামীণ ব্যাংকের সহযোগী প্রতিষ্ঠান গ্রামীণ মৎস্য ও পশু সম্পদ ফাউন্ডেশন রামসাগর জলাশয়ের চুক্তি পত্রের সকল শর্তাবলী যথাযথভাবে পালন করে এসেছে এবং ভূমিহীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে রামসাগর জলায়তনে কাঙ্খিত মাত্রায় মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে এবং ভূমিহীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র বিমোচনে সাফল্য অর্জন করেছে। এছাড়া গ্রামীণ মৎস্য ও পশুপালন ফাউন্ডেশন উদ্ভাবিত যৌথ মাছ চাষ ব্যবস্থাপনায় একটি মডেল সৃষ্টি হয়েছে। এই মডেল প্রয়োগ করে মাছ চাষের মাধ্যমে ভূমিহীন সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন এসেছে। এতে সম্পদ সৃষ্টি হয়েছে এবং স্থায়ী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।[৫১]

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এ কথা বললে হয়তোবা অত্যুক্তি হবে না যে, রামসাগর দিনাজপুর জেলার তথা সদর উপজেলার অন্ড়র্ভূক্ত একটি ঐতিহাসিক স্থান ও পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত। ঐতিহাসিক নিদর্শন ও পর্যটনকেন্দ্র হওয়ায় প্রতিদিন এখানে দেশী-বিদেশী পর্যটকদের আগমন ঘটে। পর্যটকদের নিকট থেকে প্রাপ্ত

অর্থ জেলার আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। তাছাড়া জেলা ও বাংলাদেশের পরিচিতি বিশ্ব দরবারে বিকশিত হচ্ছে। কিছু লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। খাদ্যের একটি উপাদান মৎস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে এর গুর ত্ব অপরিসীম। সুতরাং রামসাগরের আর্থ-সামাজিক প্রভাব আজকের সময়ের প্রেক্ষাপটে উপেক্ষণীয় নয়।

তথ্য নির্দেশ

১. *Bangladesh Districts Gazetteers Dinajpur*, 1975. p.1

২. নুর ল ইসলাম খান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার*, বৃহত্তর দিনাজপুর, (ঢাকা: বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ১৯৯১) পৃ. ১.

৩. মেহরাব আলী, *দিনাজপুরে ইসলাম*, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯১), পৃ. ২৪।

৪. ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে ইষ্ট ইন্ডিয়া কম্পানীর সেনাবাহিনী কর্তৃক দিনাজপুর বিজিত হওয়ার ফলে এবং ১৭৯৩ খ্রিষ্ঠাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ড় প্রবর্তনের পর নতুন ভাবে রাজস্ব এলাকা নির্ধারণ করার ফলে রাজবংশের সম্মান ও মর্যাদার পরিচয় স্বরূপ কম্পানী সরকার কর্তৃক অত্র জেলা ও শহরটির নাম দেয়া হয় দিনাজপুর। দ্রষ্টব্য: মেহরাব আলী, দিনাজপুরের ইসলাম, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯১), পৃ. ২৪।

৫. নুর ল ইসলাম খান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৯১।

৬. বুকানন পা ুয়ায় প্রাপ্ত ফার্সী পা ুলিপির সাহায্যে মন্ড়ব্য করেন যে, গণেশ একজন হিন্দু এবং দিনওয়াজের হাকিম বা শাসনকর্তা; দ্রষ্টব্য: আব্দুল করিম, *বাংলার ইতিহাস, সুলতানী আমল*, (ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশনা, ১৯৯৯), পৃ. ২২৪।

৭. অবিভক্ত বাংলার জেলা সমুহ: দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, দিনাজপুর, রংপুর, মালদা, বগুড়া, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, পাবনা, মুর্শিদাবাদ, ত্রিপুরা, বীরভূম, নদীয়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, হুগলী, হাওড়া, চব্বিশ পরগণা, যশোহর, খুলনা, ফরিদপুর, বাকেরগঞ্জ, ঢাকা, টিপেরা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম। দ্রষ্টব্য: জয়া চ্যাটার্জী, বাংলা ভাগ হল, (ঢাকা: ইউনির্ভাসিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০৩), পৃ. xvi.

৮. নাজমুল হক, *পঞ্চগড় জেলার ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯), পৃ.১।

৯. নুর ল ইসলাম খান, *পূর্বোক্ত* পৃ. ২-৪।

১০. *তদেব*, পৃ. ৭-১৫।

১১. *তদেব*, পৃ. ১৩৫।

১২. মেহরাব আলী, *দিনাজপুরে ইসলাম*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৯৬।

১৩. নুর ল ইসলাম খান, *পূর্বোক্ত* পৃ. ১।

১৪. সোহেল আহমদ, গৃহ নির্মাণ খাতে অর্থায়ন ও দিনাজপুর, শরীফ উদ্দিন আহমেদ (সম্পা), *দিনাজপুরঃ ইতিহাস ও ঐতিহ্য* (ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি, ১৯৯৬) পৃ. ৪১৫।

১৫. *Population census*-2001. p.1.

১৬. মোঃ আতাউর রহমান, *ঠাকুরগাঁও পরিক্রমাঃ ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, (ঠাকুরগাঁওঃ ঠাকুরগাঁও ফাউন্ডেশন, ২০০৫), পৃ. ৩।

১৭. নাজমুল হক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১।

১৮. বাংলাদেশ *আদম শুমারি ২০০১*, *কমিউনিটি সিরিজ*, (জেলাঃ দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড়, এপ্রিল ২০০৫), পৃ. xi।

১৯. এনামুল হক (সম্পাদিত) *জেলা পরিক্রমা দিনাজপুর*, জেলা তথ্য অফিস, (ঢাকাঃ গণযোগাযোগ অধিদপ্তর তথ্য মন্ত্রণালয়, ১৯৯০), পৃ. ৬৬।

২০. *Dinajpur District Statistics* 1983, p. 4.

২১. মোঃ আব্দুল মান্নান (সম্পাদিত) *জেলা উন্নয়ন পরিক্রমা*, দিনাজপুর, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, তথ্য মন্ত্রণালয় (ঢাকাঃ বিজি প্রেস, ২০০৫), পৃ. ৬৬।

২২. *তদেব*।

২৩. *তদেব*।

২৪. *তদেব*, পৃ. ৬৬-৬৭।

২৫. মেহরাব আলী, *দীঘির নাম রামসাগর*, (দিনাজপুরঃ তারিখ ইকবাল সবুজ, ২০০১), পৃ. ৯।

২৬. এনামুল হক, জেলা পরিক্রমা, দিনাজপুর, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৫।

২৭. মেহরাব আলী, দিনাজপুরের ইতিহাস সমগ্র, চতুর্থ খণ্ড, (দিনাজপুরঃ চিত্তরঞ্জন সাহা ১৯৭০) পৃ. ২৫৫; এনামুল হক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৫; রামসাগর কর্তৃপক্ষের সাইনবোর্ড থেকে সংগৃহীত।

২৮. মেহরাব আলী, *দীঘির নাম রামসাগর*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩।

২৯. মেহরাব আলী, *দিনাজপুরের ইতিহাস সমগ্র*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৫৭।

৩০. মেহরাব আলী, *দীঘির নাম রামসাগর*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫।

৩১. মেহরাব আলী, *দিনাজপুরের ইতিহাস সমগ্রঃ পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৫৭-২৫৮।

৩২. মেহরাব আলী, *দীঘির নাম রামসাগর*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬।

৩৩. মেহরাব আলী, *দিনাজপুরের ইতিহাস সমগ্র*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৭৯।

৩৪. মেহরাব আলী, *দীঘির নাম রামসাগর*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৩।

৩৫. *তদেব*।

৩৬. মেহরাব আলী, *দিনাজপুরের ইতিহাস সমগ্র*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৬৪।

৩৭. এনামুল হক, *জেলা পরিক্রমা*, দিনাজপুর, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৫।

৩৮. মেহরাব আলী, *দীঘির নাম রামসাগর*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৬-২৭।

৩৯. মেহরাব আলী, *দিনাজপুরের ইতিহাস সমগ্র*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৬৭।

৪০. *তদেব*, পৃ. ২৬৭-২৬৮।

৪১. রাজবংশের গৌরব যুগে রাজবাড়ীর দূর্গা প্রতিমা কাঞ্চন নদীর পরিবর্তে এই দীঘিতে বিসর্জন দেয়া হতো।

৪২. মেহরাব আলী, *দীঘির নাম রামসাগর*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৩।

৪৩. *তদেব*, পৃ. ৩৫।

৪৪. মেহরাব আলী, *দিনাজপুরের ইতিহাস সমগ্র*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৭২।

৪৫. *তদেব*।

৪৬. দিনাজপুর বন বিভাগের কর্মকর্তা কর্তৃক তথ্য সংগৃহীত, তারিখঃ ০৩/০৮/২০০৯।

৪৭. মেহরাব আলী, *দীঘির নাম রামসাগর*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৭।

৪৮. পূর্বকালে দেড় মণ পর্যন্ত ওজনের রুই, কাতলা মাছ রামসাগরে পাওয়া যেতো বলে গ্রামবাসীদের মুখে বহুল গল্প শুনতে পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এখন রামসাগরে মাছ চাষ হয়। কিন্তু দেড় মণ ওজনের রুই কাতলা মাছের কথা শুনতে এখন মনে হচ্ছে আষাড়ে গল্পের মত। দ্রষ্টব্যঃ মেহরাব আলী, *দিনাজপুরের ইতিহাস সমগ্র*, *পূর্বোক্ত*, পৃ.২৭২।

৪৯. মেহরাব আলী, *দীঘির নাম রামসাগর*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৫।

৫০. আশিশ কুমার মিশ্র, খামার ব্যবস্থাপক, গ্রামীণ মৎস্য ও পশু সম্পদ ফাউন্ডেশন পুলহাট, দিনাজপুর কর্তৃক তথ্য সংগৃহীত, তারিখ ৪/০৮/২০০৯।

৫১. মৎস্য ও পশু সম্পদ উন্নয়নবার্তা, গ্রামীণ মৎস্য ও পশু সম্পদ ফাউন্ডেশন, ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, জুন/২০০৯।